ইসলামী নীতিমালার আলোকে বরকত অর্জন

[Bengali – বাংলা – بنغالي]



সালেহ ইবন আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ আলে শাইখ



অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

التبرك في ضوء الإسلام



صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ



ترجمة: د/ محمد منظور إلهي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র



বরকত অর্জনের অর্থ

আরবীতে বলা হয় تبرك يتبرك تبركا যা আরবী ‘বারাকাহ’ শব্দ থেকে গৃহীত। তাহযীবুল লুগাহ নামক অভিধানে আবু মানসুর বলেন: “বারাকাহ শব্দের মূল হচ্ছে প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি।”

অতএব, বরকত মানে হচ্ছে কোনো জিনিসের সে প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি, তাবাররুকের মাধ্যমে বরকত লাভকারী যা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। এ প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি কখনো স্থানের মধ্যে হতে পারে, কখনো হতে পারে ব্যক্তির মধ্যে, আর কখনো গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে। এটা হয়ে থাকে তার ভাষা ভিত্তিক প্রয়োগ অনুযায়ী। আর শর‘ঈ প্রয়োগের বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরে আসছে।

প্রথম অর্থ (স্থানের মধ্যে বরকত) সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوۡقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا﴾ [فصلت: ١٠]

"তিনি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে দিয়েছেন বরকত"। [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১০]

﴿وَأَوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَاۖ﴾ [الاعراف: ١٣٧]

"যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি উত্তরাধিকারী করেছি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের, যাতে আমি দিয়েছি বরকত"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৩৭]

﴿لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ [الاعراف: ٩٦]

"আমরা অবশ্যই তাদের জন্য আকাশ ও যমীনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৯৬]

﴿وَقُل رَّبِّ أَنزِلۡنِي مُنزَلٗا مُّبَارَكٗا﴾ [المؤمنون: ٢٩]

“আর বল, হে আমার রব, আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও, যা হবে বরকতময়”। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ২৯]

দ্বিতীয় অর্থ (ব্যক্তির মধ্যে বরকত) সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

﴿وَبَٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلَىٰٓ إِسۡحَٰقَۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحۡسِنٞ وَظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ مُبِينٞ ١١٣﴾ [الصافات: ١١٣]

“আমরা তার ওপর বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাকের ওপরও। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।” [সূরা আস-সাফ্‌ফাত, আয়াত: ১১৩]

আর নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনায় আল্লাহর বাণী:

﴿ٱهۡبِطۡ بِسَلَٰمٖ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٖ مِّمَّن مَّعَكَۚ﴾ [هود: ٤٨]

“অবতরণ করুন আমার পক্ষ হতে শান্তি ও বরকত সহকারে আপনার ওপর এবং যে সকল সম্প্রদায় আপনার সঙ্গে আছে তাদের ওপর”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৪৮]

তৃতীয় অর্থ (গুণাবলীতে বরকত) সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

﴿فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ﴾ [النور: ٦١]

“অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজেদের ওপর সালাম করবে আল্লাহর নিকট হতে অভিবাদনস্বরূপ যা বরকতময় পবিত্র।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬১]

আল্লাহর তা‘আলার বাণী:

﴿وَهَٰذَا ذِكۡرٞ مُّبَارَكٌ أَنزَلۡنَٰهُۚ أَفَأَنتُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٠﴾ [الانبياء: ٥٠]

“আর এটি বরকতময় উপদেশ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার কর”? [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৫০]

আল্লাহর কিতাব নিয়ে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, তাতে এ বিষয়ের ওপর দলীল রয়েছে যে, বরকত আল্লাহর কাছ থেকেই অর্জিত হয় এবং একমাত্র আল্লাহর কাছেই তা চাওয়া যায়। তিনি সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা ও যে বস্তুতে ইচ্ছা বরকত প্রদান করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]

“জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

তিনি আরও বলেন,

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ﴾ [الفرقان: ١]

“কত বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন!” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ০১]

তিনি আরও বলেন,

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦٠]

“কত বরকতময় তিনি যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন তারকামণ্ডলী তাদের স্থান-সমেত!” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬০]

তিনি আরও বলেন,

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

“অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়”! [সূরা আল-মুমিনূন: ১৪]

তিনি আরও বলেন,

﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۝٧٨﴾ [الرحمن: ٧٨]

“কত বরকতময় তোমার রবের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব”! [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৭৮]

মূলতঃ تبارك শব্দ সম্বলিত আয়াতের সংখ্যা অনেক।

تبارك শব্দটি আল কুরআনে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হয়েই ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি বরকতের যতপ্রকার অর্থ রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, উপকারী এবং সম্পর্ক ও প্রভাবের দিক দিয়ে সমধিক ব্যাপক অর্থ প্রদানকারী।

অতএব, বরকত আল্লাহরই মালিকানাভুক্ত। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, বহুবিধ সৃষ্টিকে তিনি বরকত দান করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে:

১. নবী ও রাসূলগণ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَبَٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلَىٰٓ إِسۡحَٰقَۚ﴾ [الصافات : ١١٣]

"আমরা তার ওপর বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাকের ওপরও"। [সূরা আস-সাফ্‌ফাত, আয়াত: ১১৩]

আর ইবরাহীম ও তার আহলে বাইত সম্পর্কে বলেন,

﴿رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ﴾ [هود: ٧٣]

“হে আহলে বাইত! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৭৩]

নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿ٱهۡبِطۡ بِسَلَٰمٖ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيۡكَ﴾ [هود: ٤٨]

“অবতরণ কর আমার পক্ষ থেকে তোমার ওপর শান্তি ও বরকত সহকারে”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৪৮]

আর ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ﴾ [مريم: ٣١]

“যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

২. ইবাদাতের স্থানসমূহ, যেমন, মসজিদুল আকসা ও মসজিদুল হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ﴾ [الاسراء: ١]

“পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশকে আমরা বরকতময় করেছিলাম”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ০১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا﴾ [ال عمران: ٩٦]

“নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো বাক্কায়, বরকতময়”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৬]

৩. আল্লাহ তা‘আলা যে যিকির নাযিল করেছেন সে সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তা বরকতময়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهَٰذَا ذِكۡرٞ مُّبَارَكٌ أَنزَلۡنَٰهُۚ أَفَأَنتُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٠﴾ [الانبياء: ٥٠]

“এটা বরকতময় উপদেশ। আমরা তা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার করবে?” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৫০]

আর এ যিকির হচ্ছে মহান আল-কুরআন। যেমন, আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٌ﴾ [الانعام: ٩٢]

“এ হলো বরকতময় একটি কিতাব যা আমরা নাযিল করেছি”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯২]

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ﴾ [ص : ٢٩]

“এক বরকতময় কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে”। [সূরা সোদ, আয়াত: ২৯]

অতএব,, কুরআন হাকীম বরকতময় যিকির। **আর এর আয়াতসমূহ নিয়ে** চিন্তা গবেষণা করা বরকতময় আমল। আল-কুরআনের বিশেষ জ্ঞানসমূহ এ চিন্তা-গবেষণারই অন্তর্গত। সুন্নাহ কুরআনের মুজমাল

ও সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। আর সুন্নাহও বরকতময়। কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণও বরকতময়। কুরআনের আয়াতসমূহের গবেষণা ও সুন্নাহের সমঝ থেকে উদ্ভূত যে সকল জ্ঞান, তাও বরকতময়।

এ তিনটি প্রকারে খাস (বিশেষ) বরকত রয়েছে। এ ব্যাপারে আল কুরআন দলীল পেশ করেছে।

আর কোথাও রয়েছে ব্যাপক বরকত। এ বরকতও কয়েক প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে:

১. বৃষ্টি বরকতময়। কেননা এর দ্বারা মানুষের জীবিকা ও ফসল উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ঘটে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَنَزَّلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ مُّبَٰرَكٗا فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ جَنَّٰتٖ وَحَبَّ ٱلۡحَصِيدِ ٩﴾ [ق: ٩]

“আসমান থেকে আমরা বর্ষণ করি বরকতময় পানি এবং তদ্বারা আমরা সৃষ্টি করি বরকতময় উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি”। [সূরা কাফ, আয়াত: ০৯]

২. তম্মধ্যে আরও রয়েছে যমীনে আল্লাহর বরকত দান। যেমন, তিনি বলেন,

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ مِن فَوۡقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا﴾ [فصلت: ١٠]

“তিনি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে দিয়েছেন বরকত”। [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১০]

﴿مَشَٰرِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَا﴾ [الاعراف: ١٣٧]

“যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের, যাতে আমরা দিয়েছি বরকত”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৩৭]

৩. এর মধ্যে আরও রয়েছে আসমান থেকে যা আসে এবং যমীন থেকে যা উৎপন্ন হয় তাতে আল্লাহর বরকত দান। যেমন, তিনি বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ [الاعراف: ٩٦]

“যদি সে সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের জন্য আকাশ ও যমীনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৯৬]

এ সকল কিছু এবং তদনুরূপ অন্যান্য বস্তু ব্যাপকার্থে বরকতময়, যদ্বারা উপকার ও কল্যাণ এবং প্রবৃদ্ধি ও প্রাচুর্য অর্জিত হয়।

সম্ভবত এতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে বিশেষ বরকত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, স্থান ও গুণের সাথে নয়, তা (অন্যদের মাঝেও) এমনই সঞ্চারিত যে, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা বরকত অর্জন করা যায়। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী বরকত রয়েছে।

কিন্তু ইবাদাতের স্থান যেমন, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর সাথে খাস (বিশেষ) যে বরকত রয়েছে তা মসজিদের বিভিন্ন অংশ দ্বারা (অন্যদের

মধ্যে) সঞ্চারিত হয় না। সুতরাং মুসলিমদের ইজমা' তথা সর্বসম্মত মতানুযায়ী মসজিদের স্তম্ভ ও দেওয়াল মাসেহ করা যাবে না। অথচ মসজিদসমূহ বরকতময়। ফলে জানা গেল যে, মসজিদসমূহের বরকতের অর্থ হলো ইবাদাতকারী এতে যে কল্যাণ অর্জন করে তার মধ্যে বৃদ্ধি ঘটা। কেননা মসজিদুল হারামে একটি সালাত আদায় অন্যত্র এক ল সালাত আদায়ের সমতুল্য এবং মসজিদে নববীতে একটি সালাত আদায় অন্যত্র এক হাজার সালাত আদায়ের সমতুল্য।

আর এটা রাসূলগণের বরকতেরই অনুরূপ। কেননা রাসূলগণের বরকতের একপ্রকার হচ্ছে অনুসরণ ও আমলের বরকত। তাদের সুন্নাতের যারা অনুসারী এবং হিদায়াত দ্বারা যারা সুপথ-প্রাপ্ত, সাওয়াবের ক্ষেত্রে তাদের প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় (রাসূলগণের আদর্শ) অনুসরণের কারণে। এটাই উক্ত দু'প্রকারের সাথে খাস বরকতের অর্থ।

ব্যাপক বরকত এ থেকে ভিন্নতর। সে বরকত কখনো অর্জিত হয়, কখনো হয় না, কিংবা কোনো এক প্রকারে নিহিত থাকে, অন্য প্রকারে থাকে না। এটা সুস্পষ্ট যে, আকাশ থেকে যা কিছুই অবতীর্ণ হয় এবং যমীন থেকে যা কিছুই উৎপন্ন হয় সবসময় তা বরকতময় হয় না। বরং আল্লাহর প হতে বরকতের ব্যাপারটি অন্য কিছু বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এসব বিষয় পাওয়া গেলে আল্লাহ বরকত দেন এবং পাওয়া না গেলে বরকত চলে যায়। সুতরাং স্থান ও পাত্রের দিক দিয়ে তা ব্যাপকার্থক বরকত। আর কালের দিক দিয়ে তা খাস বরকত, যা কোনো বস্তুর জন্য অপরিহার্য নয়।

বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার পর জানা দরকার যে, কুরআন ও সুন্নাহের যে সব স্থানে বরকত কথাটি এসেছে তা দু'প্রকার:

প্রথমত: ব্যক্তি সত্তার বরকত। এ বরকতের আছর বা প্রভাব হলো, উক্ত ব্যক্তির সাথে যত কিছুরই সংযোগ রয়েছে তা বরকতময় হবে। এ প্রকার বরকত নবী ও

রাসূলগণের জন্য হয়ে থাকে। এতে অন্য কেউ তাদের অংশীদার হয় না। এমন কি এতে আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর ন্যায় বড় বড় সাহাবীগণও নবীগণের অংশীদার নন।

নবীগণের বরকতের আছর বা প্রভাব শুধু ঐ ব্যক্তিদের প্রতিই সঞ্চারিত হবে যারা নবী যে আদর্শের দাওয়াত দিয়েছেন তার ওপর চলেছেন, তার আমলের অনুসরণ করেছেন, তার নির্দেশ মান্য করেছেন এবং তার নিষেধ করা বস্তু থেকে বিরত থেকেছেন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যখন অহুদ যুদ্ধে তার নির্দেশ অমান্য করল এবং তার নাফরমানী করল, তখন তার বরকত তাদের দিকে সঞ্চারিত হয় নি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর এ প্রকার বরকত সঞ্চারিত হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তার দেহের কোনো অংশ যদি তার মৃত্যুর পর কারো কাছে নিশ্চিতভাবে বর্তমান থাকে, তবে সেটার

কথা আলাদা। আর সাহাবীদের যুগ অতিবাহিত হয়ে যাবার পর সে নিশ্চয়তাও রহিত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত: আমল ও অনুসরণ করার বরকত। এটি ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী হয়। প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ যতটুকু অনুসরণ করে ও মেনে নেয়, আদেশ ও নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে সে ততটুকু আমলের বরকত লাভ করতে পারে।

এজন্য ইমাম বুখারী তার সহীহ বুখারী গ্রন্থে [৯/৫৬৯] খেজুর গাছ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে এসেছে- "নিশ্চয় এমন কিছু বৃক্ষ রয়েছে যার বরকত মুসলিম ব্যক্তির বরকতেরই অনুরূপ"। অতএব, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার মর্যাদা অনুযায়ী বরকত রয়েছে।

আর এ বরকত ব্যক্তিসত্তার বরকত নয়। এটা নিশ্চিতভাবে জানা কথা এবং কেউ তা দাবীও করে নি। বরং এটা শুধু আমলেরই বরকত।

আল্লাহর সৎ, অনুসারী বান্দাদের মধ্যে ততটুকু পরিমাণ আমল ও অনুসরণের বরকত রয়েছে, ঐ বরকতের যতটুকু চাহিদা মোতাবেক কাজ তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সুন্নাহ বিষয়ক আলেমের রয়েছে ইলমের বরকত এবং যিনি আল্লাহর কিতাবের হাফেজ ও এর সীমারেখা মেনে চলেন, তার মধ্যে উক্ত আমলের ফলাফল স্বরূপ বরকত থাকবে। আর তদনুরূপ সকল ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।

সৎকর্মশীলগণের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বরকত ঐ ব্যক্তিরই হবে যিনি দীন ইসলামের সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করেন, এর ওয়াজিবসমূহের সর্বাধিক সংরক্ষণ করেন এবং হারাম-বস্তুসমূহ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকেন।

হারাম কাজসমূহের অনেকগুলো অন্তর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বহু লোক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যে হারাম কাজ হয়ে থাকে তা হতে দূরে থাকে, অথচ অন্তরের দ্বারা হারাম কাজ করে বেড়ায়, এ ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না।

এভাবে কুরআন-সুন্নাহর দলীলসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়। অতএব, নবীগণের মধ্যে যে বরকত রয়েছে তা ঐ বরকতের অন্তর্গত যাতে বরকতের উভয় প্রকার বিদ্যমান। আর তারা ছাড়া অন্যান্যদের যে বরকত দেওয়া হয়েছে তা হলো আমল, ইলম ও অনুসরণের বরকত। ফলে এ বরকতের আছর ও ফলাফল আপনি আমল ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সঞ্চারিত হতে দেখবেন না, স্বয়ং কোনো ব্যক্তি দ্বারাও নয়, আর তার অংশ বিশেষ দ্বারাও নয়।

এজন্যই তায়াম্মুম শরী‘আতসম্মত হওয়ার কারণ বর্ণনায় উসাইদ ইবন হুদাইর বলেন, “হে আবু বকরের পরিবারবর্গ! আপনাদের মধ্যেই আল্লাহ মানুষের জন্য

বরকত ঢেলে দিয়েছেন”। এটি ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থের তাফসীর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

কথাটি যে শব্দে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের কাছে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, “হে আবু বকরের পরিবারবর্গ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়”। কথা দু’টোর অর্থ একই। আর এটা জানা কথা যে, উসাইদ কিংবা অন্য কেউ আবু বকর কিংবা তার পরিজনের কাছে ব্যক্তি সত্তার বরকত অনুসন্ধান করেন নি, যেমন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ইত্যাদি দ্বারা বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে করতেন।

নিশ্চয় এ ছিল আমল তথা ঈমান, সত্যতা প্রতিপন্নকরণ, (দীনের) সহায়তা ও অনুসরণেরই বরকত।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়ায়রিয়া বিনতে আল হারেসকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে বরকতের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা এ প্রকার বরকতেরই অন্তর্ভুক্ত।

তিনি বলেছিলেন, "স্বীয় জাতির কাছে তার চেয়ে বেশি বরকতময় কোনো মহিলা আমি দেখি নি"। হাদীসটি উত্তম সনদে ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রন্থে ও ইমাম আবু দাউদ সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

এ হচ্ছে আমলের বরকত, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়ায়রিয়াকে বিবাহ করেছেন। ফলে তা ছিল তার জাতির বহু লোকের দাসত্ব থেকে আযাদীর ও মুক্তির কারণ।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বরকত অর্জন

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিসত্তার দিক দিয়ে বরকতময় ছিলেন, গুণাবলীর দিক দিয়ে বরকতময় ছিলেন, কাজকর্মেও বরকতময় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিসত্তায়, গুণাবলীতে ও কাজকর্মে এ বরকত নিশ্চিতরূপে বিরাজমান ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী থেকে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যে, তারা তাঁর শরীর হতে বিচ্ছিন্ন বস্তু যেমন, চুল, অযুর পানি, ঘাম ইত্যাদি দ্বারা বরকত অর্জন করতেন। এ বিষয়ে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এবং হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস এসেছে।

আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণকে যত প্রকার বরকত দান করেছেন তন্মধ্যে সর্বোচ্চ বরকত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত। তাঁর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বরকত অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত হতে

পারে এবং তদ্বারা বরকত অর্জন করা জায়েয, যেমন, একদল সাহাবী করেছিলেন।

আর যে সব স্থানের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ছিল, যেমন, যে স্থানে তিনি চলাফেরা করেছেন কিংবা যেখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন অথবা যে ভূমিতে তিনি অবতরণ করেছেন, শরী'আতে এমন কোনো দলীল পাওয়া যায় নি যাতে এমন ইশারা ও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের বরকত উক্ত স্থানে সঞ্চারিত হয়ে তা বরকতময় হয়েছে এবং তদ্বারা বরকত অর্জন বৈধ। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পর তার সাহাবীগণ এ কাজ কখনো করেন নি।

অতএব, যে পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলাফেরা করেছেন অথবা যেখানে তিনি অবতরণ করেছেন তা দ্বারা বরকত অর্জন জায়েয হবে না। কেননা এ কাজ ঐ স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যে স্থানসমূহের প্রতি সম্মান

প্রদর্শনের বৈধতা শরী‘আত আমাদের জন্য প্রণয়ন করে নি। অধিকন্তু তা শির্কে লিপ্ত হওয়ার একটি মাধ্যমেও পরিণত হবে। আর যে জাতিই তাদের নবীদের স্মৃতিবিজড়িত চিহ্নসমূহের অনুসরণে লিপ্ত ছিল তারাই বিভ্রান্ত ও ধ্বংস হয়ে গেছে।

মা‘রুর ইবন সুয়াইদ আল-আসাদী বলেন: আমীরুল মমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের সাথে মক্কা থেকে আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। অতঃপর ভোর হলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি দেখলেন, লোকজন একটি স্থানে গমন করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এরা কোথায় যাচ্ছে?

তাকে বলা হলো: হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মসজিদে সালাত আদায় করেছিলেন। তারা সে মসজিদে এসে সালাত পড়ে।

তিনি বললেন: “তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ ধরনের কাজের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা তাদের

নবীদের স্মৃতিবিজড়িত চিহ্নসমূহের অনুসরণে লিপ্ত ছিল এবং এগুলোকে তারা উপাসনালয় ও ইবাদাতের স্থানে পরিণত করেছিল। এ সকল মসজিদে কেউ নামাযের সময় উপস্থিত হলে যেন সালাত আদায় করে নেয়। অন্যথায় সে যেন উক্ত স্থানসমূহে গমনের ইচ্ছা না করে চলে যায়"। সাঈদ ইবন মানসূর তার সুনান গ্রন্থে, ইবনু আবি শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে (২/৩৭৬) এবং আন্দালুস (তথা প্রাচীন স্পেন) এর মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবন ওয়াদ্দ্যাহ আল-কুরতবী 'বিদ'আতসমূহ ও তা হতে নিষেধকরণ' নামক গ্রন্থে (পৃ. ৪১) ঘটনাটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন।

এ হচ্ছে সেই খলীফায়ে রাশেদের উক্তি যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ উমারের হৃদয়ে ও জিহ্বায় (তথা বাকযন্ত্রে) হক প্রতিভাত করেছেন"। ইমাম আহমাদ (২/৯৫) বিশুদ্ধ সনদে ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য সনদেও (২/৫৩) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমাদ (৫/১৪৫), আবু দাউদ (২৯৬২ নং হাদীস) এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমাদ (২/৪০১) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এছাড়াও আরও অনেকে এ হাদীসটি এ সকল সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবীদের থেকেও বর্ণনা করেন।

সন্দেহ নেই, স্মৃতিবিজড়িত চিহ্নসমূহ অনুসরণের ব্যাপারে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরোক্ত বাণী সে হকেরই অন্তর্গত যা আল্লাহ তার জিহ্বায় প্রতিভাত করেছেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

ইবন ওয়াদ্দ্যাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন (পৃ. ৪৩), “মালিক ইবন আনাস ও মদীনার অন্যান্য আলিমগণ ক্বোবা ও অহুদ ছাড়া এ সকল মসজিদসমূহে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত এ চিহ্নসমূহে আগমন করা অপছন্দ করতেন”।

ইবন ওয়াদ্দ্যাহ বলেন: “আয়িম্মায়ে হুদা তথা হিদায়াতের ইমামরূপে যারা পরিচিত, তোমাদের ওপর

ওয়াজিব তাদের অনুসরণ করা। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ বলেন, এমন অনেক ব্যাপার রয়েছে যা আজ বহু লোকের কাছে সৎকর্ম-রূপে প্রতীয়মান, পূর্ববর্তীদের কাছে তা ছিল অন্যায়, প্রিয় হবার জন্য করা হচ্ছে অথচ তা তার ওপর ঘৃণার উদ্রেককারী, নৈকট্য লাভের জন্য করা হচ্ছে অথচ তা তাকে দূরে নিক্ষেপ করে। আর প্রত্যেক বেদআতের ওপরই লেপটে আছে সৌন্দর্য ও আনন্দ"। লক্ষ্য করুন ইবন ওয়াদ্দ্যাহের এ সুদৃঢ় উক্তির প্রতি। তার মৃত্যু হয়েছিলো হিজরী ২৮৬ সালে।

এ কথার উদ্দেশ্য হলো সালাফ তথা পূর্ববর্তী ইমামগণ স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন স্থানসমূহ দ্বারা বরকত অর্জনকে অস্বীকার করতেন। তারা এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং বরকত লাভের আশায় এগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সমর্থন করতেন না।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে খেলাফ করেন নাই। তিনি সে সকল স্থানসমূহের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন যেখানে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সে সকল স্থানে সালাত পড়েন যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেছিলেন। অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি এ রকম আমল করেছিলেন।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী থেকে এটা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি যে, তাদের কেউ স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে ইবন উমারের মতই আমল করেছেন।

আর ইবন উমার স্থানের বরকত তালাশ করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় যত আমল করেছেন, প্রত্যেকটি আমলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে। এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল স্থানে সালাত পড়েছেন, তিনি তার সব কয়টি স্থানে সালাত পড়তে চেয়েছেন। তিনি সে সবের সন্ধান করতেন এবং জানতেন। প্রতীয়মান হয় যে, স্থানের মাধ্যমে বরকত

লাভের উদ্দেশ্যে তার এ আমল ছিল না, যে রকম পরবর্তীরা মনে করেছেন, বরং পূর্ণ অনুসরণই উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভিন্ন মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোনো সাহাবী সে আমল করেন নি এবং তাতে সায়ও দেন নি, বরং তার পিতা স্মৃতি বিজড়িত সে সব স্থান অনুসন্ধান করতে লোকদেরকে নিষেধ করেছেন। মতভেদের সময় তার কথা তার ছেলের মতের ওপর সর্বসম্মতিক্রমে প্রাধান্য পাবে। আর সাহাবীগণ কর্তৃক ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার আমল ত্যাগ করার ওপর তাদের মতৈক্যের মোকাবেলায় এ মতভেদ ধোপে টিকে না। সন্দেহ নেই, এ ব্যাপারে হক ও সঠিক কথা ছিল উমার ও অন্য সকল সাহাবীদের। আর এটাই হচ্ছে অনুসরণের উপযোগী এবং মতভেদের সময় সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত।

সৎ ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিসত্তার দ্বারা বরকত অর্জন

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিসত্তার বরকত শুধু ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে যাকে এ বরকত দেওয়ার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। যেমন, নবী ও রাসূলগণ।

কিন্তু তারা ব্যতীত আল্লাহর অন্যান্য সৎ বান্দাগণের বরকত হচ্ছে আমলের বরকত। অর্থাৎ এ বরকত তাদের ইলম, আমল ও অনুসরণ থেকে উদ্ভূত, তাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে নয়। সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের বরকতের মধ্যে রয়েছে মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, তাদের জন্য দোয়া করা এবং সৎ নিয়তে সৃষ্টির প্রতি ইহসান করার মাধ্যমে উপকার পৌঁছানো প্রভৃতি।

তাদের আমলের বরকতের মধ্যে রয়েছে ঐ সব কল্যাণ যা আল্লাহ তাদের কারণে দান করেছেন এবং তাদের সংস্কার কাজের বরকতে যে শাস্তি ও ব্যাপক আযাব আল্লাহ প্রতিরোধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمٖ وَأَهۡلُهَا مُصۡلِحُونَ ١١٧﴾ [هود: ١١٧]

“আর আপনার প্রভু এমন নয় যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী”। [সূরা হূদ, আয়াত: ১১৭]

আর এমন বিশ্বাস করা যে, তাদের ব্যক্তিসত্তা বরকতময় হওয়ার কারণে বরকতের উদ্দেশ্যে সর্বদা তাদেরকে স্পর্শ করা, তাদের উচ্ছিষ্ট পান করা ও তাদের হাতে চুমু খাওয়া এবং তদনুরূপ আমল করা যেতে পারে- মূলতঃ এ ধরণের বিশ্বাস নবীগণ ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। তার কারণ হলো:

প্রথমত: কোনো ব্যক্তিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছতে পারেন নি। অতএব, বরকতে ও মর্যাদায় কিভাবে তিনি তাঁর সমকক্ষ হবেন?

দ্বিতীয়ত: এমন কোনো শর‘ঈ দলীল পাওয়া যায় নি যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যরাও শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা

বরকত অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ। অতএব, এ বিষয়টি তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতোই তাঁর সাথেই সুনির্দিষ্ট।

তৃতীয়ত: অলী হওয়ার দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অন্যদেরকে কিয়াস করার আলোচনায় ইমাম শাতেবী রাহেমাহুল্লাহ তার আলই'তেসাম গ্রন্থে (খ. ২, পৃ. ৬-৭) বলেন, “এ (কিয়াসের) ক্ষেত্রে একটি নিশ্চিত (ভাষ্যের দিক থেকে) শক্তিশালী দলীল আমাদের বিরোধিতা করছে, যা উক্ত কিয়াস বাস্তবায়নের অন্তরায়। আর তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর কোনো খলীফার ব্যাপারে কোনো সাহাবীর পক্ষ থেকেই এমন কিছু ঘটেনি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের মধ্যে তাঁর পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাইতে উত্তম কাউকে রেখে যান নি। অতএব, তিনিই ছিলেন তাঁর খলীফা। অথচ তার দ্বারা (বরকত লাভের) ঐ সব কিছুই করা হয় নি। আর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বারাও করা হয়নি, অথচ তিনি

ছিলেন আবু বকরের পর উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। অনুরূপভাবে উসমান, আলী ও সকল সাহাবীদের কারো দ্বারাই বরকত লাভের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় নি, উম্মাতের মধ্যে যাদের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তদুপরি জানা বিশুদ্ধ পন্থায় তাদের কারো ক্ষেত্রেই এটা সাব্যস্ত হয়নি যে, বরকত অর্জনে প্রত্যাশী কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত কিংবা অনুরূপ কোনো পন্থায় তাদের কারো দ্বারা বরকত লাভের প্রয়াস পেয়েছেন[1]। বরং তারা এ সকল সাহাবীদের ক্ষেত্রে সে সব আমল, কথা ও সীরাতের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন যেগুলোতে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অনুসরণ করেছিলেন। মূলতঃ এ ছিল উক্ত জিনিসসমূহ পরিহারের ব্যাপারে তাদের ইজমা' তথা সর্বসম্মত মত"।

[1] এখানে তিনি শরীরের ঘাম, চুল ও অযুর পানি ইত্যাদি দ্বারা বরকত অর্জন বুঝিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রেও তারা উক্ত আমল করেন নি।

সুতরাং ব্যক্তিসত্তার বরকত বীর্য দ্বারা স্থানান্তরিত হয় না। চরমপন্থি শিয়া ও তাদের অনুসারী অন্যান্য মোকাল্লেদরাই এ ছাড়া ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে।

চতুর্থত: 'সাদ্দুয যারায়ে' তথা হারামে লিপ্ত হওয়ার পথ রুদ্ধ করা শরী'আতের একটি বড় মূলনীতি। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে দলীল রয়েছে। আর সুন্নাহেও এ সম্পর্কে বহু বিশুদ্ধ দলীল রয়েছে, যা একশতের কাছাকাছি পৌঁছবে। সম্ভবত এ কারণেই সৎ ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিসত্তা দ্বারা বরকত লাভের ব্যাপারটি ধারাবাহিকতা পায় নি, বরং তা নবীদের সাথেই খাস ছিল।

পঞ্চমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো দ্বারা এ ধরনের বরকত অর্জনের কাজটি সাধিত হলে তা ঐ ব্যক্তিকে ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার কিংবা

তদ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ থেকে মুক্ত থাকার কোনো নিরাপত্তা দেয় না। ফলে এ দ্বারা সে ব্যক্তি গৌরব, অহংকার, লোক দেখানো ও আত্মপ্রশংসায় ব্যাপৃত হয়ে যেতে পারে। এ সবই অন্তর দ্বারা কৃত হারাম কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

পরিচ্ছেদ

‘আল-মাফাহীম’ নামক গ্রন্থের লেখক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিসত্তা কিংবা কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা বরকত অর্জনের ব্যাপারে হাদীস ও আছার বর্ণনা করার পর ১৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন, “এ আছার ও হাদীসগুলোর মোদ্দাকথা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, তার চিহ্নসমূহের মাধ্যমে ও তার সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুর মাধ্যমে বরকত অর্জন সুন্নাতে মারফুআ‘ এবং শরী‘আতসম্মত প্রশংসিত পন্থা”।

আমি বলি, এ কথার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। নিরীক্ষণ না করা এবং হাদীসের উক্তিসমূহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করাই এর কারণ। কেননা ‘আল মাফাহীম’ গ্রন্থকার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিসত্তা কিংবা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ দ্বারা বরকত অর্জন এবং যে সকল স্থানে তিনি সালাত পড়েছেন কিংবা বসেছেন সে

সব স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ দ্বারা বরকত অর্জনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করেন নি।

বরকত অর্জনের প্রথম বিষয়টি (যেমন, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই করা হয়েছে এবং তিনি তা অনুমোদনও করেছেন। অতএব, তা সুন্নাত ও শরী‘আতসম্মত।

কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি তথা স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ দ্বারা বরকত অর্জন শরী‘আতসম্মত নয়। এজন্যই ‘আল মাফাহীম’ গ্রন্থকার এমন কোনো দলীল নিয়ে আসতে পারেননি যদ্বারা “মারফু‘ সুন্নাত” বলে তিনি যে দাবী তুলেছেন তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। এ বক্তব্য মূলতঃ পৃথক বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ না করা এবং মুহাক্কিক উলামাদের পথ পরিত্যাগ করারই শামিল।

স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ দ্বারা বরকত অর্জন যে শরী‘আতসম্মত নয়, বরং তা নব-আবিস্কৃত আমল, সে ব্যাপারে প্রমাণ বহনকারী বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বরকত অর্জনের এ প্রকারটি ছিল না। এ বিষয়ে বিশুদ্ধ, উত্তম ও দুর্বল কোনো সনদেই সঠিকভাবে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি। কেননা এমন কোনো বর্ণনা নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর চিহ্ন সম্বলিত কোনো স্থানের মাধ্যমে কেউ বরকত অর্জন করেছেন। অতএব, এ ধরনের বর্ণনার কার্যকারণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও এবং এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনার হিম্মত থাকা সত্ত্বেও যখন তা বর্ণিত হয়নি, জানা গেল যে, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় ছিল না। আর এমন ধরনের বিষয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করা বিদ‘আত। প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। বিদ‘আত থেকে নিষেধ করা এবং তার বিরোধিতা করা ওয়াজিব।

খলিফায়ে রাশিদ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজ থেকে ও স্মৃতি চিহ্ন বিজড়িত স্থান তালাশ করা থেকে নিষেধ করার প্রতিই দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যা

ইতোপূর্বে মা'রূর ইবন সুয়াইদ আল আসাদীর বর্ণনায় এসেছে।

দ্বিতীয়ত: নবী ও রাসূলগণের ব্যক্তিসত্তার বরকত ভূ-স্থানের প্রতি সঞ্চারিত হয় না। অন্যথায় এ বিষয়টি অবধারিত হয়ে যাবে যে, তারা যে সকল স্থান মাড়িয়েছেন কিংবা যে স্থানে বসেছেন অথবা যে স্থান দিয়ে তারা অতিক্রম করেছেন, সে সব স্থানের বরকত অনুসন্ধান করে তা দ্বারা বরকত অর্জন করা যাবে। আর সন্দেহাতীতভাবে যেহেতু এ ব্যাপারটি বাতিল, অতএব, এ দ্বারা যা অবধারিত হলো তাও বাতিল বলে গণ্য।

তৃতীয়ত: স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জনের অন্বেষা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেকার সকল নবীদের সুন্নাতের খেলাফ। কেননা তারা তাদের পূর্ববর্তী নবীদের চিহ্ন সম্বলিত স্থান অনুসন্ধান করেন নি এবং তা করতে নির্দেশও দেননি। এর বিপরীত যা কিছুই হয়েছে, তা

পরবর্তী লোকেরাই (যারা এমন কাজ করতো যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয় নি) তাদের নবীদের পর উদ্ভাবন করেছে, যখন শর‘ঈ বিধান মেনে চলা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা চিহ্ন সম্বলিত স্থান দ্বারা বিদ‘আতী পন্থায় বরকত অর্জনের মাধ্যমে পাপের ক্ষমাপ্রাপ্তি ও অধিক হারে পুণ্য অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে। এজন্যই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এরকম কাজের ফলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত চিহ্নসমূহের অনুসরণ করত”। ইতোপূর্বে এ হাদীসটি কোথায় কোথায় সংকলিত হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থত: কোনো স্থানে সার্বক্ষণিক ইবাদাতে মশগুল থাকার মাধ্যমেই শুধু সে স্থান বরকতময় হতে পারে। আর ইবাদাতে মশগুল থাকাটাই মূলতঃ সে স্থানে আল্লাহর বরকত দেওয়ার কারণ। এজন্যই মসজিদসমূহ বরকতময়। ইবাদাত না হলে এ স্থানসমূহের বরকত আর থাকে না।

এর একটি উদাহরণ হলো: যে সমস্ত মসজিদ কুফুরী শক্তির কুক্ষিগত হয়েছে এবং তারা সেগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করেছে, সেগুলো থেকে মসজিদের ঐ বরকত চলে গিয়েছে, ইবাদাত কর্ম সম্পাদনকালে যে বরকত সেগুলোতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেখানে শির্কী কার্য সম্পাদন হওয়ার পর এবং ইসলামী শরী'আত ছাড়া অন্য নিয়মে তাতে ইবাদাত হওয়ার পর সেখানকার বরকত চলে যায়। এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক ও বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশই নেই।

পঞ্চমত: স্মৃতি বিজড়িত স্থান দ্বারা বরকত অর্জনের বিষয়টি সে স্থানকে পবিত্র বলে সাব্যস্তকরণ ও সে সমস্ত স্থানে (বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের মতো) বিশ্বাস করার ন্যায় আরও বড় ভয়াবহ ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা ঐতিহাসিকগণ ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের সন্তানদের সম্পর্কে বলেন: "মক্কা তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। আর তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটল এবং শত্রুতা সৃষ্টি হলো। **তারা একে অন্যকে বের করে**

দিল। অতঃপর তারা বিভিন্ন দেশে জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ল। আর যা তাদেরকে প্রতিমা ও পাথর পূজার দিকে ঠেলে দিয়েছিল তা হলো, হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং মক্কার প্রতি ভালবাসা পোষণের কারণে প্রত্যেক মুসাফিরই তার সাথে হারামের কোনো একটি পাথর না নিয়ে মক্কা থেকে সফর করত না”।[2]

আর যার বৈশিষ্ট্য এমন- তা নিষিদ্ধ হওয়ার অধিক উপযোগী। কেননা শরী‘আতসম্মত নয় এমন বিষয়ের দিকে যে মাধ্যম ধাবিত করে, সে মাধ্যমটিও শরী‘আত-অসমর্থিত, যেন উক্ত কাজের দ্বার রুদ্ধ হয় এবং মাধ্যমটির মূলোচ্ছেদ ঘটে।

আরবী কবি বলেন:

“নিশ্চয় সালমা ও তার প্রতিবেশিনী থেকে সালামাত তথা নিরাপত্তা লাভের উপায় হলো, সে যেন তার

2 দেখুন, আল-আসনাম পৃ. ৬। তবে আমি দলীল নেওয়ার জন্য এ উদ্ধৃতি পেশ করি নি, বরং তাদের অবস্থা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনার জন্য।

উপত্যকায় আগমনকারী কোনো ব্যক্তির কাছে গমন না করে"।

ষষ্ঠত: (রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত) বরকতের যে দু' প্রকার আজ আমাদের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে, তার মাধ্যমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তার থেকে বরকত লাভের প্রত্যাশা ও তা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সাধিত হতে পারে । আর সে বরকত হলো তাকে অনুসরণের (মাধ্যমে অর্জিত) বরকত, তার সুন্নাত অনুযায়ী আমলের বরকত, তার সুন্নাতের যারা শত্রু ও শরী'আতের নির্দেশের যারা বিরোধিতাকারী এবং যে সব মুনাফিক মানুষকে ফেতনায় লিপ্ত করে ও বিভ্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের (মাধ্যমে অর্জিত) বরকত। এর প্রতিই তাবেয়ীন ও সঠিক পথের দিশা-দানকারী ইমামগণ প্রমুখ সালাফে সালেহীন উৎসাহ প্রদান করেছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারভাবে মহব্বত করেছেন। অতঃপর তাকে অনুসরণের ততটুকু বরকত তাদের অর্জিত হয়েছে

যতটুকু আল্লাহ মঞ্জুর করেছেন। এতদ্ব্যতীত স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত স্থান দ্বারা বরকত অর্জন তারা পরিত্যাগ করেছেন। অতএব, বুঝা গেল যে, যে কাজটি তারা পরিত্যাগ করেছিলেন সেটি তাদের মাঝে পরিচিত ছিল না, আর শরী'আতসম্মতও ছিল না।

হিদায়াত ও আল্লাহর প থেকে তাওফীক প্রত্যাশীর জন্য এ বিষয়গুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। আর সঠিক কথা ও কাজে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য রয়েছে যথেষ্ট উপকরণ। নিশ্চয় হক তথা সত্য-ই অনুসৃত হওয়ার সর্বাধিক উপযোগী। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৎকর্মসমূহের তাওফীকদাতা।

'আলমাফাহীম' গ্রন্থকার ১৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন: "কুরআন-হাদীসের যে সকল দলীল আমরা বর্ণনা করেছি তা দ্বারা ঐ ব্যক্তির অসত্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে ধারণা করে- ইবন উমার ছাড়া আর কোনো সাহাবী এ কাজের প্রতি গুরুত্ব দেন নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের আর কোনো সাহাবী ইবন উমারের সমর্থনে অনুরূপ আমল করেন নি।

এটা হলো মূর্খতা কিংবা মিথ্যাবাদিতা অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা।

কেননা ইবন উমার ছাড়াও আরও অনেকে এ আমল করেছেন এবং তৎপ্রতি গুরুত্বও আরোপ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: খোলাফায়ে রাশেদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুম, উম্মে সালামাহ, খালেদ ইবন ওয়ালীদ, ওয়াসিলা ইবন আলআসকা, সালামা ইবন আকওয়া, আনাস ইবন মালেক, উম্মে সুলাইম, উসাইদ ইবন হুদাইর[3], সাওয়াদ ইবন গাযিয়া, সাওয়াদ ইবন আমর, আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আবু মূসা, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাস সাফীনাহ, উম্মে সালামার খাদেম সাররা, মালেক ইবন সিনান, আসমা বিনতে আবু বকর, আবু মাহযুরা, মালেক ইবন আনাস এবং মদীনাবাসী

3 এখানে খুদাইর লিখা ছিল। আমি তা শুদ্ধ করে দিলাম।

তার অনেক মাশাইখ যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ"।

সাহাবী ও তাবেঈদের প্রতি সম্পর্কিত করে যে বিবরণ এখানে পেশ করা হলো সে ব্যাপারে আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করেই আমি বলবো, এখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছে:

এক. ইবন উমার একাই স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন বলে বক্তব্য পেশকারীর প্রতি 'আলমাফাহীম' গ্রন্থকার মিথ্যাচার, মূর্খতা ও ধুম্রজাল সৃষ্টির যে অপবাদ দিয়েছেন তা অতীব মন্দ ও নিন্দনীয়।

কেননা হাদীস, ফিক্হ ও দীনের বড় বড় যে সকল ইমামগণ ইবন উমার এককভাবে উক্ত আমল করেছেন বলে বক্তব্য পেশ করেছেন, এটা ভাবা যায় না যে, তাদের কনিষ্ঠরা তাদেরকে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।

দুই. (আল-মাফাহীম গ্রন্থকারের) এ বক্তব্যই বরং অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রতি সম্পর্কিত হওয়ার অধিক উপযোগী। কেননা ব্যক্তিসত্তার বরকত ও স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত স্থানের মধ্যে যে ব্যক্তি পার্থক্য নিরূপণ করে না, তার কথা প্রত্যাখ্যান করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

তিন. যারা এ সকল সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করেছেন, তারা তাদের থেকে এটাই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তারা তার দেহের যে সব চিহ্ন বর্তমান ছিল তা দ্বারা এবং তার ঘাম, জুব্বা ও চাদর প্রভৃতি দ্বারা বরকত অর্জন করেছেন, যদি এ বর্ণনা শুদ্ধ হয়ে থাকে। অন্যথায় তাহকীক করলে দেখা যাবে, এ বিষয়ে সামান্য কিছু ছাড়া আর বিশুদ্ধ কিছুই পাওয়া যায় না।

সুতরাং যিনি (পূর্বোক্ত বিষয় দু'টির মধ্যে) পার্থক্য করেছেন, তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না, বরং এটাই বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শক্তিশালী কথা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জ্ঞানকে পরিমাপ করে দেখেনি এবং সবচেয়ে

কম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও কম জানা লোকের সমকক্ষ হয়েও তুষ্ট থেকেছে, জ্ঞানবানদের কাছে তার কথার কোনো মূল্যই নেই।

আল-মাফাহীম গ্রন্থকারের এ অন্ধ গোঁড়ামী দ্বারা সে সব লোক প্রতারিত হবে যারা তার প্রতি সুধারণা রাখে এবং তার ইলমের ওপর ভরসা রাখে। কিয়ামতের দিন তাদের হবে কঠিন অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ﴾ [البقرة: ١٦٦]

“যখন অনুসৃতগণ অনুসারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৬]

‘আল-মাফাহীম’ গ্রন্থকার ইবন উমার ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো সাহাবী থেকে সহীহ কিংবা উত্তম সনদে এটা বর্ণনা করতে পারবেন না যে, তিনি স্মৃতি বিজড়িত স্থান দ্বারা বরকত অর্জন করেছেন।

চার. মদীনার ইমাম ও আলিম ইমাম মালেকের সাথে উক্ত বরকত অর্জনের যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে তা শুদ্ধ নয়। কেননা মালেক রাহিমাহুল্লাহ স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত স্থান অনুসন্ধান করতে নিষেধ করতেন। বরং তিনি মদীনার বড় বড় তাবেয়ীন থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আর মালিকের সাথীদের গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

তন্মধ্যে স্পেনের মুহাদ্দিস ইবন ওয়াদ্দ্যাহ স্বীয় "বিদআ'ত ও তা থেকে নিষেধকরণ" নামক গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় বলেন: "মালেক ইবন আনাস ও মদীনার অপরাপর আলিমগণ উক্ত মসজিদসমূহে আসা অপছন্দ করতেন। অথচ সে সবই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই স্মৃতিচিহ্ন, একমাত্র কোবা ও উহুদ ছাড়া"।

সুতরাং ইমাম মালিকের মাযহাবের প্রতি যিনি সম্পর্কিত, কেন এ মাসায়েলগুলোতে তিনি মালেকী হতে পারলেন না, হতে পারলেন না সালাফী? যেমন,

ছিলেন ইমাম মালেক (আল্লাহ তাকে প্রশস্ত রহমাত দিয়ে করুণা করুন)।

পরিচ্ছেদ

সালাফ ও সালাফিয়াতের প্রতি সম্পর্কিত হওয়ার অর্থ

মুসলিমগণ দু'প্রকার:

একদল হলো সালাফে সালেহীনের অনুসারী।

আরেক দল হলো পরবর্তী যুগের লোকদের সমঝের অনুসারী। এদেরকে প্রায়ই বিদ'আতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। কেননা যারা ইলম ও আমল এবং সমঝ ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের তরীকা পছন্দ করে না, এর অনিবার্য পরিণতিতে তারা বিদ'আতে আক্রান্ত হন এবং পরিশেষে বিদ'আতী বলে পরিচিত হন।

আর সালফে সালেহীন হলেন: উত্তম যুগের আলিম ব্যক্তিবর্গ। তাদের সম্মুখ সারীতে ও অগ্রভাগে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ- আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন স্বীয় বাণী দ্বারা:

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا ﴾ [الفتح: ٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে"। [সূরা আল-ফাত্‌াহ, আয়াত: ২৯]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাদের প্রশংসা করেছেন এ কথা বলে যে, "সর্বোত্তম লোক হলো আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তৎপরবর্তী যুগের লোকেরা..."।

সমস্ত সাহাবীদের প্রশংসায় এবং তাদের চলার পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে স্বয়ং সাহাবীগণ এবং তাদের সঠিক অনুসারীদেরও একের পর এক বক্তব্য এসেছে।

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "তোমাদের কেউ যদি কারো আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের

আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা তারা এ উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যময় হৃদয় ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী, যে সমস্ত ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই সে সমস্ত ব্যাপারে বক্তব্য দেওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে, অনুরূপভাবে তারা সর্বাধিক সঠিক হেদায়াতের ওপর এবং (আমলের দিক থেকে) সর্বোত্তম অবস্থায় ছিলেন। তারা এমন একদল লোক যাদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দীন কায়েমের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানুন এবং তাদেরকে পদে পদে অনুসরণ করুন। কেননা তারাই ছিলেন সরল সঠিক হিদায়াতের ওপর”।

এ বিষয়টি আহলে সুন্নাতের সবার সর্বসম্মত মত। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। অতএব, তারা যখন এমন বিশাল মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তখন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম ব্যক্তি আল কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা, বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী আমলের

ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত নীতির সাথে সম্পর্কিত হতে গৌরববোধ করবে।

মুসলিম উম্মার বিভ্রান্ত প্রত্যেক ফিরকাই সালাফে সালেহীন কুরআন ও হাদীসকে যেভাবে বুঝেছেন তার বিপরীত বুঝ নিয়ে কুরআন-হাদীসের দলীল নিজ নিজ মত ও উদ্দেশ্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে পেশ করছে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তারা একে অপরকে কাফির বলছে এবং আল্লাহর কিতাবের একাংশ দিয়ে অন্য অংশের ওপর আঘাত হানছে। প্রত্যেক ফিরকার দাবী অনুযায়ী এসব কিছুই তারা কুরআন-হাদীসকে যে যেভাবে বুঝছে সেভাবে করছে। ফলে বিভ্রান্ত প্রত্যেক ফিরকাই বলছে যে, আমরা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করি। এতে দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ও কম ইলমের অধিকারী লোকদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে গেল।

এসব বিভ্রান্তিকর দাবী ও কথা থেকে বের হবার উপায় হলো সর্বোত্তম যুগের নীতির অনুসরণ। সে যুগের লোকেরা কুরআন-সুন্নাহের বক্তব্য থেকে যা বুঝেছেন

তাই হক ও সত্য, আর যা তারা বুঝেননি এবং আমলও করেন নি তা সত্য ও সঠিক নয়।

আর অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে যারা জ্ঞান আহরণ করেছেন, তারা সুন্দরভাবে তাদেরকে অনুসরণ করেছেন। অতএব, যে-ই আল-কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবীদের এ নীতির অনুসরণ করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাদের যেসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ, তা গ্রহণ করে আর নিরেট বুদ্ধিভিত্তিক মতামত ও নব উদ্ভাবিত সমঝ ত্যাগ করে, সে-ই সালাফী হিসাবে পরিচিত হবে। আর যে সে রকম হতে পারবে না, সে খালাফী ও বিদ‘আতী বলে গণ্য হবে।

এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জানা দরকার যে, প্রত্যেকটি ইলমী মাসআলা তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়:

এক: এ মাসআলার অনুকূলে সাহাবী ও তাদের অনুসারীবৃন্দ বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের সকলেই সে

অনুযায়ী আমল করেছেন, কিংবা কিছুসংখ্যক সে অনুযায়ী আমল করছেন এবং অন্য কেউ তার বিরোধিতা করেন নি।

দুই: কিছুসংখ্যক সাহাবী সে অনুযায়ী আমল করেছেন, তবে অধিকাংশ সাহাবী মাসআলাটিতে তাদের খেলাফ করেছেন।

তিন: উক্ত মাসআলা অনুযায়ী তাদের কেউ আমল করেন নি।

অতএব, এ হলো মোট তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার, যাতে সকল সাহাবী মাসআলা অনুযায়ী আমল করেছেন, অথবা কেউ কেউ করেছেন তবে অন্য কেউ বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়নি, সন্দেহাতীতভাবে তা এমন সুন্নাত যার অনুসরণ করা যায় এবং যা পুরোপুরি স্পষ্ট নীতি, সরল পথ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। অতএব, উক্ত মাসআলায় তাদের বিরোধিতা করা কারো জন্যই জায়েয নেই। আকীদা ও ইবাদাতের

ক্ষেত্রে এর উদাহরণ অনেক এবং এত অধিক যে, তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার হলো যাতে কতিপয় সাহাবী উক্ত মাসআলা অনুযায়ী আমল করেছেন এবং অধিকাংশ সাহাবী তাদের খেলাফ করেছেন। কেননা স্বল্পসংখ্যক সাহাবী যে মত এখতিয়ার করেছেন এবং যেরূপ আমল করেছেন, অধিকাংশ সাহাবী তা ভিন্ন অন্য মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও অন্যরূপ আমল করেছেন। ইমাম শাতেবী 'আল-মুয়াফিকাত ফী উসুলুশ শরী'আহ' গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ৫৭) অধিকাংশ সাহাবীর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার প্রসঙ্গে বলেন: "উক্ত ভিন্ন আমলই (তথা অধিকাংশ সাহাবীর আমলই) অনুসৃত সুন্নাত এবং সরল পথ। অন্যদিকে যে কাজটি অল্প সংখ্যক ব্যতীত আর কেউ করেনি, সে কাজটির ব্যাপারে এবং সে অনুযায়ী আমলের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আর যা অধিক ব্যাপক ও অধিকাংশের আমল, তা-ই সর্বদা করা উচিত।

কেননা এ স্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা করে পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক সর্বদা ভিন্ন আমল হয়ত শর‘ঈ কোনো কারণে সাধিত হয়েছে, কিংবা শর‘ঈ কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে।

কিন্তু স্বল্পসংখ্যকের বিপরীত তাদের এ আমল শর‘ঈ কারণ ছাড়া অন্য কারণে হওয়ার ব্যাপারটি ঠিক নয়। বরং অবশ্যই তা হয়েছে শর‘ঈ কোনো কারণে, যার ভিত্তিতে তারা আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এ বিষয়টি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন স্বল্পসংখ্যকের মতানুযায়ী আমল করার ব্যাপারটি উক্ত শর‘ঈ কারণটির বিরোধী বলে গণ্য হবে- যার ভিত্তিতে অধিকাংশ সাহাবীগণ চিন্তাভাবনা করে আমল করেছেন। যদিও তা প্রকৃতপক্ষে বিরোধী না হয়ে থাকে। অতএব, তারা যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ও যে আমল তারা সর্বদা করেছেন তদনুরূপ আমল করা জরুরী”।[4]

---

4 ইমাম শাতেবী অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন। নুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াও তার ‘আত-

এরপর তিনি বলেন (খ. ৭০, পৃ. ৭১) ‘এজন্য আমলকারীর উচিত পূর্ববর্তীদের নিয়ম অনুযায়ী যেন আমল করতে পারে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তাই স্বল্পসংখ্যকের পদ্ধতিতে আমলের অনুমতি সে যেন নিজেকে না দেয়। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন আমল করা যেতে পারে, যদি তাতে অনুমতি থাকে এবং আমল রহিত হওয়ার কিংবা দলীল শুদ্ধ না হওয়ার আশংকা না থাকে অথবা এমন আশংকা না থাকে যে, পেশকৃত দলীলটি প্রমাণ হিসাবে গণ্য হওয়ার মত শক্তিশালী নয়।

কিন্তু যদি কেউ সর্বদা স্বল্পসংখ্যকের আমল অনুসরণ করে, তবে তাতে নিম্নের ব্যাপারগুলো অবধারিত হয়ে পড়বে:

তাওয়াসসুল ওয়াল উসীলাহ’ গ্রন্থে অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন।

এক: পূর্ববর্তীগণ সর্বদা যে কাজ করতেন তার বিরোধিতা করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আর পূর্ববর্তী সালাফদের বিরোধিতা করার মধ্যে বড় বিপদ রয়েছে।

দুই: সালাফগণ সর্বদা যে কাজ করতেন তা ছেড়ে দেওয়া অবধারিত হয়ে যাবে। কেননা উদ্দেশ্য হলো তারা এ বর্ণনাগুলোর বিপরীতমুখী কাজে সর্বদা রত ছিলেন। সুতরাং তারা যে আমল করেন নি সে অনুযায়ী আমলে রত থাকা তারা যে আমল সর্বদা করতেন তার বিপরীত।

তিন: এটা অধিকাংশ সাহাবী যে আমল করেছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণ এবং বিপরীত আমল (তথা স্বল্পসংখ্যকের আমল) প্রসিদ্ধি লাভ করার হেতু। কেননা কাজের অনুসরণ কথার অনুসরণের চেয়ে সুদূরপ্রসারী। আর এটা যখন ঘটে এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার অনুসরণ করা হয়, তখন ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়ায় আরও ভয়াবহ।

সাবধান! সাবধান! পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা করা থেকে সতর্ক থাকুন। তাতে যদি কোনো ফযীলত থাকত, তাহলে পূর্ববর্তীরাই তার বেশি হকদার হতেন। আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করছি"। [ইমাম শাতেবীর কথা এখানেই শেষ]

আর তৃতীয় প্রকার যাতে উক্ত মাসআলা অনুযায়ী সাহাবীদের কেউই আমল করেন নি, এমতাবস্থায় বিতর্কের অবকাশ নেই যে, সকল সাহাবীর আমলের বহির্ভূত যে আমল তা বিদ'আত ও নিন্দনীয় (যদি উক্ত কাজের মাধ্যমে আমলকারী তার রবের নৈকট্য লাভের আশা করে। অবশ্য যদি তা (ইবাদাত না হয়ে) আদত তথা দৈনন্দিন প্রথার অন্তর্গত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো) তা মুবাহ বলে গণ্য হবে।

আর এজন্য যে ব্যক্তিই এমন কোনো আমল করে যা সালাফ তথা পূর্ববর্তী আলিমগণের তরীকা মাফিক নয় এবং কুরআন ও সুন্নাহকে তারা যেভাবে বুঝেছেন সে অনুযায়ীও নয়, তাকে বলা হবে: "তুমি বাতিলপন্থী,

বিদ‘আতী ও যে পথ মুমিনদের নয় সে পথের অনুসারী”।

ইলমের সাথে সম্পর্কিত কিছু লোক বিভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে সব নব উদ্ভাবিত বিষয় (তথা বিদ‘আত)-কে উত্তম বলে চালিয়ে দিচ্ছে, যদ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ নৈকট্য লাভ (তথা ইবাদাত) করেন নি।

‘এসবই দীনের ক্ষেত্রে ভুল হিসেবে বিবেচিত এবং নাস্তিকদের পথ অনুসরণের নামান্তর। কেননা যারা এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করেছে এবং এ পথে চলেছে, হয় শরী‘আতকে তারা এমনভাবে বুঝেছে যেমনটি পূর্ববর্তীগণ বুঝেন নি অথবা শরী‘আতকে (সঠিকভাবে) বুঝা থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছে।

এ শেষোক্ত কথাটিই সঠিক। **ক**েননা সালাফে সালেহীনের অগ্রবর্তী দলই সরল সঠিক পথের ওপর ছিলেন। তারা উপরোক্ত দলীলসমূহ প্রভৃতি থেকে তা-ই বুঝেছেন যে নীতির ওপর তারা ছিলেন। আর এ নব

উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ তাদের মধ্যে ছিল না এবং সে অনুযায়ী তারা আমলও করেন নি'।[5]

নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত: তন্মধ্যে কিছু আছে শির্ক, আর কিছু এমন বিদ‘আত যা শির্কের দিকে নিয়ে যায়, আর কিছু এমন বিদ‘আত যা সুন্নাতকে মিটিয়ে দেয়।

আর এ উদ্ভাবিত বিষয়গুলোর কোনো প্রকারই সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে কখনই ছিল না। কেননা তাদের যুগে এমন কোনো কবর ছিল না যার পাশে ইবাদাতের নিয়তে অবস্থান করা হত, যার ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা হত এবং যার অধিবাসীদের উসীলায় শাফা‘আত চাওয়া হত।

আর তাদের সময়ে নবী ও সৎ ব্যক্তিবর্গের সম্মান অথবা মান-মর্যাদা কিংবা ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অসীলা করার ব্যাপারটি ছিল না এবং কবরের কাছে দো‘আ করার প্রচলনও ছিল না। তাদের সময়ে মীলাদ তথা

5 ইমাম শাতেবীর আল মুয়াফাকাত খ. ৩, পৃ. ৭৩।

জন্মদিবস পালন এবং মীলাদ-মাহফিল বা জন্মদিবসের অনুষ্ঠান নামেও কিছু ছিল না। মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে এসব কিছুই তাদের মাঝে অনুপস্থিত ছিল।

অতএব, এ-ই যখন অবস্থা, তখন পরবর্তীরা এ বিদ‘আতসমূহের উপযোগিতা প্রমাণের জন্য যেসব ভ্রান্ত যুক্তি পেশ করছেন, তা তিনভাগে বিভক্ত:

এক: কুরআনুল কারীমের আয়াত, তারা বাড়াবাড়ি করে এর অর্থ বিকৃত করে নিজ নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করছে।

দুই: হাদীস, তা আবার দু’ প্রকার:

প্রথম প্রকার: সহীহ হাদীসসমূহ যা তাদের উদ্দেশ্য ও বুঝের মুওয়াফিক নয়। তবে তারা এগুলোর অর্থ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিকৃত করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার: মিথ্যা ও দুর্বল হাদীস। তাদের কাছে এ ধরনের হাদীসের সংখ্যাই বেশি এবং তারা এগুলো

নিয়ে খুবই খুশী। এগুলোর প্রচার ও প্রসারের জন্য চলে তাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা।

তিন: কিসসা-কাহিনী ও স্বপ্ন, যা তারা পারস্পরিক ধারা পরম্পরায় বর্ণনা করে থাকে এমনভাবে যে, মনে হয় তা শরী'আত প্রণয়নের একটি উৎস।

তারা আল-কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা যে দলীল পেশ করছে, তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় দু'টি:

১. বিদ'আতীগণ যে কথা দ্বারা দলীল পেশ করছে, তা মূলতঃ দলীলের উদ্দিষ্ট অর্থ নয়। কেননা উক্ত দলীল দ্বারা বিদ'আতীরা যা বুঝে থাকে, সালাফের অনুসারী আহলে সুন্নাতের বুঝ তা থেকে ভিন্নতর। অতএব, সালাফের বুঝের মাধ্যমে খালাফের বুঝ প্রত্যাখ্যাত হবে।

২. দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম কথা থেকেই উৎসারিত। আর তা হলো এ প্রশ্ন করা যে, সালাফে সালেহীন কি উক্ত দলীলের ক্ষেত্রে খালাফ তথা পরবর্তী লোকদের বুঝ অনুযায়ী আমল করেছেন, নাকি আমল করেন নি?

সর্বসম্মত মত হলো, সালাফগণ এ উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ দ্বারা কখনোই আমল করেন নি। কোনো বিদ‘আতীই সালাফগণ থেকে এমন কোনো আমল প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না, যা সাহাবীদের আমলের খেলাফ। কেননা আহলে সুন্নাত পূর্ববর্তীগণ তথা সাহাবী ও তাবেঈদের আমলের অনুসারী। আর খালাফগণ এর বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। তারা এমন কাজ করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়নি।

এ অর্থেই উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “অচিরেই এমন লোকজন আসবে যারা আল কুরআন থেকে কিছু ভ্রান্ত যুক্তি বের করে তা দ্বারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। অতএব, তোমরা সুন্নাহ দিয়ে তাদের মোকাবেলা কর। কেননা সুন্নাহ বিশারদগণ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে।”[6]

6 দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৭। এছাড়া লালকাই সুন্নাহ গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল বির 'জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী’ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে

এজন্যই কোনো বিভ্রান্ত ফিরকা কিংবা খালাফীদের কাউকেই আপনি এমনটি পাবেন না যে, তারা নিজ নিজ মতের ওপর বাহ্যিক দলীল পেশ করতে অক্ষম। অথচ এ ক্ষেত্রে দলীল শুদ্ধ হওয়াটাই হলো আসল ব্যাপার, দলীল পেশ করতে সমর্থ হওয়া নয়।

ইমাম শাতেবী এ ধরনের সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলার পর (খ. ৩, পৃ. ৭৭) বলেন: ‘এ কারণেই শর‘ঈ দলীল ও প্রমাণ নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করবেন, তাদের ওপর ওয়াজিব হলো, উক্ত দলীল থেকে পূর্ববর্তীগণ কি বুঝেছেন ও এ দলীল দ্বারা আমলের ক্ষেত্রে তাদের কি ভূমিকা ছিল, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা এটাই সত্যে উপনীত হওয়ার অধিক উপযোগী এবং ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী।

দারাকুতনী ও ইবন আবি যমানাইন ‘ফসুলুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। মাকদেসী আল-হুজ্জাহ আ‘লা তারেকিল মাহাজ্জাহ’ গ্রন্থে এবং আরও অনেকে এর পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।

এ ব্যাপারটি যখন স্পষ্ট হয়ে গেল এবং সত্য প্রতিভাত হলো, তখন সালাফে সালেহীনের প্রতি সম্পর্কিত হতে যারা গৌরববোধ করে, তারা উল্লিখিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এটাও জানে যে:

১. সাহাবীদের যে আমলটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল, তারা সে অনুযায়ী আমল করেছেন।

২. যে আমল মাত্র একজন সাহাবী করেছেন অথবা কিছু সংখ্যক করেছেন আর বাদ বাকী সাহাবীগণ প্রথমোক্তদের বিরোধিতা করেছেন- এ ক্ষেত্রে তারা বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করেছেন, যেমনটি তাদের রব তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি বলেন:

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء : ٥٩]

“কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক দিয়ে প্রকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

এখানে আল্লাহর দিকে বিষয়টি প্রত্যাবর্তিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এর মানে হলো আল্লাহর কালাম তথা অবতারিত কুরআন হাকীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেও প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো তার জীবদ্দশায় তার কাছে প্রত্যাবর্তন করা এবং তার মৃত্যুর পর তার সহীহ সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে অধিকাংশের আমল অনুসরণের জন্য চিন্তা গবেষণা করা।

আল-হামদুলিল্লাহ! আহলে সুন্নাতের এ নিয়মে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নি। এতে কোনো গরমিলও দেখা যায়নি। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট নিয়ম এবং পরিষ্কার নীতি ও সরল-সোজা পথ। চার ইমাম তাদের অধিকাংশ মাসআলায় এ নিয়মের ওপরই চলেছেন। আল্লাহ

তাদেরকে রহম করুন এবং তাদের সাওয়াব বৃদ্ধি করুন।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীয়ে কেরাম ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে সকল আমল করেন নি, সেগুলো (কেউ করলে তা হবে) উদ্ভাবিত আমল যা খালাফী তথা পরবর্তীরা চালু করেছে।

সাহাবী ও তাবেঈগণ যা কিছু থেকে বিরত ছিলেন, তা ছিল তাদের সঠিক চিন্তাভাবনা প্রসূত এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহকে প্রশংসনীয়রূপে বুঝার কারণে। পরবর্তীকালের বিদ‘আত প্রচলনকারীদের তৈরি করা একই আসবাব ও কারণ সাহাবীদের যুগেও পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তারা শরী‘আতের ব্যাপার ভালো করে বুঝে-শুনেই সে সব পরিত্যাগ করেছিলেন। আর তাদের পরিত্যাগ করার কাজটি (আমাদের জন্য) অনুকরণীয় সুন্নাত এবং অনুসৃত পথ।

পরবর্তী লোকজন যে আমল দ্বারা পুণ্য ও সাওয়াব পাওয়ার আশা করে থাকে অথচ সাহাবীরা সে আমল থেকে বিমুখ থেকেছেন, তা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা সাহাবীগণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী ছিলেন এবং শরী'আতসম্মত ইবাদাতে লিপ্ত হতে সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করতেন। তারা শরী'আতসম্মত প্রত্যেকটি আমলকে কার্যে পরিণত করতেন এবং তদ্বারা সাওয়াবের আশা করতেন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতেন।

গ্রহণে ও বর্জনে, বুদ্ধি ও জ্ঞানে, বুঝে ও আমলে যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে, সে কতই না বুদ্ধিমান! আর সকল কল্যাণ ও নৈকট্য লাভের কতই না উপযুক্ত এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়ার কতই না যোগ্য!

বরকত মানে হচ্ছে কোনো জিনিসের সে প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি, তাবাররুকের মাধ্যমে বরকত লাভকারী যা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। এ প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি কখনো স্থানের মধ্যে হতে পারে, কখনো হতে পারে ব্যক্তির মধ্যে, আর কখনো গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে। ইসলামী আকীদার আলোকে বরকত অর্জনের কোন দিকগুলো শরী'আত সমর্থিত এবং কোন দিকগুলো শরী'আত সমর্থিত নয়